আকাশ

তাহমিদ হাসান মুত্তাকী

[বইটি পুনরায় অনলাইনে আপলোড করা থেকে বিরত থাকার জন্য
বিনীতভাবে অনুরোধ করা হলো।]

আকাশ

তাহমিদ হাসান মুত্তাকী

পিডিএফ সংস্করণ
প্রকাশকাল: জুন ২০২৫
নির্ধারিত মূল্য: ৩০ টাকা

এক

পাহাড়ঘেরা এই জনপদ। একদিকে নদী বয়ে গেছে। শহরের সাথে যোগাযোগ শুধু সরু এক পাহাড়ি পথে। নদীপথে যদি যেতে চাও, তবে অপেক্ষা করতে হবে বড় ট্রলারগুলোর জন্য, যেগুলো বছরে কয়েকবার শুধু ব্যবসার পণ্য নিয়ে আসে। অথচ এরই মাঝে জীবন তার পথ করে নিয়েছে নিজের মত করে। যেন পাথরের মাঝে বেড়ে ওঠা সবুজ এক চারাগাছ চিৎকার করে বলছে, আমি বেঁচে আছি।

লোককথা কিংবা কিংবদন্তী হয়ে গল্পগুলো এখানে চলে এসেছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে। এমন এক সভ্যতার গল্প যাদের নিঃসঙ্গতা হার মানায় আর সব নীরবতাকে। অনিকের মনে পড়ে শীতের সন্ধ্যায় দাদী যখন সে গল্পগুলো বলতেন। বিদ্যুৎ তখনো এই এলাকাতে আসেনি। মোমবাতির নিভু নিভু আলোতে তন্ময় হয়ে শুনতো ওরা, "যখন রাইতে ঘোর বৃষ্টি নামে, ওই সময়ে পাহাড়ের দিকে দেখবি নীল আলো জ্বলতেসে। তবে ওইদিকে খবরদার যাইস না। একবার গেলে আর ফিরতে পারবি না।"

অনিকের ছোট বোন মায়া প্রশ্ন করতো, "দাদী, এটা গল্প নাকি সত্যিই?"
"ধুর বোকা! সত্যি কেন হবে, গল্প এগুলো," অনিক বলত।
দাদী কিছু বলতেন না, শুধু হাসতেন।

জীবন সহজ ছিলো তখন। শীতকালে স্কুল যখন বন্ধ থাকতো, তখন জীবন সবচেয়ে সুন্দর মনে হত। সারাদিন কী করছ খোঁজ রাখার কেউ ছিলো না। অনিক ওর বন্ধু রাফি আর রাহাতদের সাথে পাহাড়ের মাঝে অদ্ভুত কিছু বা নতুন কোন গুহা খুঁজে বেড়াতো। কখনো কখনো মায়া কিংবা ছোটরাও থাকতো সাথে, তাদের আগ্রহ ছিলো লোককথার সেই হারিয়ে যাওয়া জগতের দরজা খুঁজে বের করা। দিনগুলো সুন্দর চলছিলো।
তারপর একদিন, মায়া হারিয়ে গেলো!

দুই

পাহাড়ের ওপরে নীলাভ আলো। মায়া হাতছানি দিয়ে ডাকছে সেখান থেকে। অনিক সেদিকে আগানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ক্রমশ পাহাড়টা যেন দূরে সরে যেতে থাকে। ঘুম ভেঙে যায় ঠিক তখন। একটা চাপা আর্তনাদ অনিকের হৃদয়কে ঘিরে ধরে। দূর থেকে ট্রেনের বাঁশির আওয়াজ ভেসে আসে। মনে পড়ে ফেলে আসা সে গ্রামের কথা, যেখানে ছোটবেলায় গল্প শোনানো সেই দাদী ঘুমিয়ে আছে চিরনিদ্রায়। মা-বাবা যেখানে আছে। হারিয়ে যাওয়া ছোট বোনটার স্মৃতি যার প্রতিটা কোণায় মিশে আছে।

মায়া হারিয়ে যাওয়ার পর অনিকের মনে হয়েছিলো জীবন বোধহয় থেমে যাবে। কিন্তু জীবন কীভাবে যেন ঠিকই তার পথ খুঁজে নেয়। গ্রামের একমাত্র স্কুলটা প্রাইমারিতেই শেষ। রেজাল্ট ভালো ছিলো। স্যাররা তার বাবাকে বলেছিলেন শহরে পাঠাতে, পড়াশোনা করিয়ে যেতে। গ্রাম ছেড়ে বড় শহরের দিকে যাওয়া- অনিকের চোখেমুখে তখন ছিলো স্বপ্ন আর আনন্দ। কিন্তু মা-বাবার চোখে বিষাদ ছাড়া কিছু ছিলো না। তখন তার মানে বুঝেনি অনিক। চার বছর পর, এখন প্রতি মুহূর্তে সে বিষাদমাখা যন্ত্রণা তাকে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়।

কখনো অনিকের মনে হয় একদিন গ্রামের দিকে যাওয়া ট্রেনটা ধরে রওনা দিবে। ওখান থেকে ভ্যানগাড়িগুলো পৌঁছে দিবে পাহাড়গুলোর কাছে। তারপর আবার হাঁটবে চিরচেনা সেই পাথরগুলোতে ঘেরা পাহাড়ি পথে গ্রামের দিকে।

কিন্তু...

কিন্তু কী যেন তাকে বাঁধা দেয়। অনিকদের গ্রামে টেলিফোন পৌঁছায়নি। মা-বাবার সাথে কথা শুধু চিঠিতে হয়েছে। রাফি, রাহাত আর স্কুলের সব বন্ধুরা- ওরা গ্রামে থেকে গেছে। অনিক শহরে। ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর সাহস হয় না।

দরজায় কড়া নাড়ে কেউ।

“অনিক! রুমে আছিস?” আবিরের গলা। অনিকের ক্লাসমেট।

“দরজা খোলা, ভেতরে আয়।”

দরজার নব ঘুরিয়ে ভেতরে আসে আবির। কাঁধের ব্যাগটা নামিয়ে বসে পড়ে বিছানায়।

“এখনই উঠলি ঘুম থেকে?”

“এইতো।... নাস্তা করেছিস?”

“না, এজন্যই ডাকতে আসলাম। চল।"

... ...

“চুপচাপ যে?” খিচুড়ির গ্রাস মুখে তুলে নিতে নিতে জিজ্ঞেস করে আবির।

“না, কিছু না। বাসার কথা মনে পড়ছে।"

আবির কিছু বলে না। ওরও হয়ত মনে পড়ে ফেলে আসা দিনগুলোর স্মৃতি। ব্যস্ত শহরের কোলাহল যে স্মৃতিগুলো কেড়ে নিতে পারে না।

অনিক নীরবতা ভাঙে, “ম্যাগাজিনের জন্য কোন লেখা দিচ্ছিস এবার?”

“একটা গল্প দিয়েছি।”

“দেখালি না?”

“আগে দেখালে তো হলো না, ম্যাগাজিন বের হলে পড়িস। তুই দিচ্ছিস কিছু?”

“নাহ! লিখতে গেলে পুরনো স্মৃতিগুলো মনে পড়ে। ভাবনাগুলো আর শব্দ হয়ে ওঠে না।"

“খেয়েছে! সাহিত্যিক মানুষজন। তোদের গ্রাম থেকে ঘুরে আয় না একবার?”

“হ্যা। চিন্তা করছি। যাবো। যেতে হবে।"

যেতে হবে, মনে মনে বারবার প্রতিধ্বনি করতে থাকে অনিক।

তিন

সারি সারি ফসলের ক্ষেতগুলো ভেদ করে ট্রেন এগিয়ে চলেছে। দু'পাশের গাছগুলো দৃষ্টির অন্তরালে হারিয়ে যাচ্ছে দুরন্ত গতিতে। শুধু রাতের আকাশটা আছে তার জায়গায়। চাঁদ নেই আজ আকাশে। তবু তারাগুলো ঠিকই তার মিটিমিটি আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। অনেকদিন এভাবে আকাশ দেখেনি অনিক। শহরের বিদ্যুৎ বাতির ভিড়ে তারাদের মৃদু আলোগুলো হার মানে। কিন্তু আজ বহুদিন পর ঊষা, অনিরুদ্ধ আর চিত্রলেখ আবারও সফরসঙ্গী হয়েছে অনিকের। হাজার হাজার বছর ধরে যেভাবে মানুষকে সঙ্গ দিয়ে এসেছে ওরা। ওই তারাদের মাঝে কীভাবে যেন মানুষ খুঁজে পেয়েছে লুকিয়ে থাকা এক শিকারীকে। কিন্তু তারাদের মাঝে অনিক খুঁজে ফিরে মায়াকে। রাতের তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে মায়ার চোখগুলো ওই তারাদের মতই জ্বলজ্বল করত।

রাতের ট্রেনের ভেতরেও রাত নামছে। অনিকের পাশের যাত্রীও ঘুমিয়ে পড়েছে ততক্ষণে। অনিকও একসময় হারিয়ে যায় ঘুমের অন্তরালে।

চার

যদি তুমি অরিত্রি গাছের পাতাগুলো বেটে নেও, বেশ সুন্দর সবুজ রং পেয়ে যাবে। আর ফুলগুলো তোমাকে দিবে লাল রং। হলুদ রং বানানোটা একটু কঠিন। তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে সে সময়ের জন্য যখন কাঞ্চন ফুলগুলো ঝরে যায়। সদ্য ঝরে যাওয়া ফুলগুলো যদি তিনদিন ভিজিয়ে রাখো, তাহলে ওটা রং ছাড়তে শুরু করবে। যদি এই তিনটে রং তোমার কাছে থাকে, তবে তুমি যে রং খুশি সে রং বানাতে পারবে ওগুলো মিশিয়ে। কালো মাটির স্লেটে আঁকতে আরেকটা রঙ লাগবে তোমার, সাদা। ওটা সহজ, সাদা পাথরগুলো দিয়ে বেশ চলে যায়।

নীরা একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করছে। তারাময় আকাশের ছবি। আর তার নিচে বিস্তৃত মাঠ। নীরা কখনো আকাশ দেখেনি। শুধু শুনেছে ওপরের পৃথিবীর আকাশটা নাকি রাতে তারায় ছেয়ে যায়।

"এরকম?" জিজ্ঞেস করে নীরা।

হাততালি দিয়ে ওঠে মায়া। "ঠিক এরকম!"

"ওপরের পৃথিবীটা অনেক সুন্দর, না?"

"হ্যা," উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মায়ার চেহারা, "দিনের আলো, রাতের তারা..." থেমে যায় মায়া। নীরার চেহারায় বিষণ্ণতার ছাপ। আপন মনে আরেকবার পুনরাবৃত্তি করে সে, "ওপরের পৃথিবীটা অনেক সুন্দর, তাই না?"

পাঁচ

অধ্যাপক আজমত ব্যস্তভাবে রুমের এ মাথা থেকে ও মাথা পায়চারি করে চলেছেন। কম্পিউটার স্ক্রিনের গ্রাফগুলো তাকে অস্থির করে রেখেছে। শুরু হয়েছিলো গতকাল স্যাটেলাইটের পাঠানো ডেটায় গ্রাভিটিতে সামান্য পরিবর্তন থেকে। অত্যাধুনিক যন্ত্র ছাড়া ধরাও যেত না। কিন্তু তার কারণ যত খুঁজতে গেছেন, সমস্যা তত জটিল হয়েছে।

"স্যার, চা দিব?" ল্যাব অ্যাসিস্টেন্ট রহমত জিজ্ঞেস করে।

"চা?... হ্যাঁ, দেও। চিনি বেশি।"

'আজমইতে আইজ আবার চিনি খাইতে চায় ক্যা,' মনে মনে ভাবে রহমত।

মুখে বলে, "জ্বী স্যার, দিচ্ছি।"

আরেকবার গ্রাফগুলোতে চোখ বুলানোর চেষ্টা করেন অধ্যাপক আজমত। 'কী হতে পারে এর অর্থ?'- নিজেকে প্রশ্ন করেন। 'গ্রাভিটির পরিবর্তন, পৃথিবীর অরবিটে কোন অ্যাস্টেরয়েড আসা বা অন্য কারণে হওয়া সম্ভব।' কিন্তু অধ্যাপক জানেন সেটা তার প্রশ্নের উত্তর না। 'কিন্তু তেমন কোন কিছু রাডারগুলোতে ধরা পড়েনি। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ডের গ্রাফও তার সাথে মিলছে না। চেঞ্জটা আরো ফান্ডামেন্টাল কিছু।'

“স্যার, চা।" রহমত চা রেখে যায় টেবিলে।

অনেকক্ষণ পরেও রহমত দেখে চা সেভাবেই পড়ে আছে, অধ্যাপকের ভাবনার নিমগ্নতা তখনো কাটেনি।

ছয়

ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। রেলস্টেশনে নেমে অনিকের কেমন যেন একটা গা ছমছমে ভাব মনে হয়। আশেপাশে কুলিদের হাঁকডাক, গাড়ির শব্দ। কিন্তু সবকিছুর ভিড়ে অনিকের অসম্ভব একা মনে হয় নিজেকে। মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু আর পরিচিত মুখগুলো আরেকবার দেখার জন্য একদিকে মন তোলপাড় করে ওঠে, আর অন্যদিকে কী এক সংকোচ এসে তাকে ঘিরে ধরে। দূরের পাহাড়গুলো এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। একটা ভ্যানগাড়ি ধরে অনিক।

অনিকের মনে হয়েছিলো পাহাড়গুলো তার চিরচেনা- প্রতিটা পাথর তার আপন। কিন্তু আজ মনে হয় সেই পথ যেন অভিমানী হয়ে আছে তার ওপর। দুয়েকবার শঙ্কা হয় ভুল পথে যাচ্ছে কিনা। তবে শেষাবধি ঠিকই পৌঁছে যায় নিজ গন্তব্যে। কী মনে করে পাহাড়ের একটু ওপরটায় উঠে গ্রামটাকে এক নজরে দেখে। মনে হয় যেন ঠিক আগের মতই, অথচ

যেন কত ভিন্ন। কিছু দালান উঠতে শুরু করেছে। বিদ্যুতের খুঁটি চোখে পড়ে কিছু। গ্রামেও যেন শহরের ছোঁয়া লাগছে।

গ্রামে ঢুকে প্রথমেই দেখা হয় মনা পাগলার সাথে। ছোটবেলায় অনিক কিছুটা ভয় পেতো তাকে। আজ অবশ্য অনিকের মনে অদ্ভুত উচ্ছ্বাস জেগে উঠে তাকে দেখে।

“ভালো আছেন মনা ভাই?”
“আমার নাম তো মনা না।"

পাগলাটে হাসির মাঝেও অনিক কী যেন একটা খুঁজে পায় মনা পাগলার উত্তরে। অবাক হয় অনিক। পাগলা ডাক আর অপমান যার নিত্যসঙ্গী, মনা নাম নিয়ে আপত্তি কেন তার? বাপ-মা কি তাকে অন্য কোন নাম দিয়েছিলো, আজ যে নাম সে খুঁজে বেড়ায়? অদ্ভুত হাসির আড়ালে চাপা কোন যন্ত্রণা কি তাকেও তাড়িয়ে বেড়ায়?

“তাহলে কী নাম আপনার?” অনিক জিজ্ঞেস করে।

মনা পাগলা হাসে। জবাব দেয় না। অনিক বুঝে উঠে না কী করবে। শেষে সন্তর্পনে সরে এসে আবারো পথ ধরে। পেছনে তাকিয়ে দেখে একটা গাছের ডাল কুড়িয়ে মাটিতে আপন মনে দাগ কাটছে মনা পাগলা।

সাত

রাহাতরা চার ভাইবোন। রাহাত সবার ছোট। দুই বোনের বিয়ে হয়েছে। বড় ভাই বাজারে একটা মুদি দোকান চালায়। স্কুলের পাঠ শেষ হওয়ার পর আপাতত বাবার কৃষিকাজে সাহায্য করা, আর মাঝে মাঝে ভাইয়ের দোকানে বসা- এর বাইরে তেমন কিছু করছে না সে।

ইচ্ছে আছে সামনে গ্রামরক্ষীদের দলে যোগ দেয়ার অথবা শহরে গিয়ে কোন খাবার দোকানে চাকরি নেয়ার। শহরে টাকা কামানো সহজ- শুনেছে সে।

মাঝে মাঝে এই বিচ্ছিন্ন গ্রামে পড়ে থাকা নিয়ে জীবনের ওপর একটু অভিমান হয় না, এমন না। অনিকের ওপর কিছুটা ঈর্ষাও হয়। শহরে গিয়ে একটা চিঠি দেয়ারও কি সময় হয় না?- ভাবে রাহাত।

দ্রুত হাত চলছে রাহাতের। রোদ তীব্র হওয়ার আগেই চারাগুলো লাগানো শেষ করতে চাইছে। দূরে রাস্তায় কারো ছায়া চোখে পড়ে। ছায়াটা কাছে আসতে থাকে। রাহাতের হঠাৎ মনে হয় হাঁটার ভঙ্গিটা খুব পরিচিত। একটু সময় নেয় চিনতে, তারপরই মনে হয়- অনিক না! হাতের কাজ ফেলে দৌঁড়ে যায় সেদিকে।

রাহাত ভেবেছিলো একরাশ ক্ষোভ ঝারবে। কিন্তু শুধু বলে, “এতদিন পর!”

অনিক রাহাতকে জড়িয়ে ধরে। পরিষ্কার পোশাকে কাদামাটি লেগে যায়, ওদিকে খুব একটা ভ্রুক্ষেপ করে না।

আট

তপ্ত দুপুরগুলোতে বাড়ির মুরগিগুলোকে খাবার দিয়ে এসে চুলায় দু'জনের ভাত তুলে দেয়ার সময় এক শূন্যতায় হাহাকার করে ওঠে মনোয়ারা বেগমের বুক। অনিকের বাবা যখন হাটের দিকে রওনা দেন, একেবারে একা হয়ে যান তিনি। কত বছর হলো মেয়ের হারিয়ে যাওয়ার? ছেলের মুখ আর কতদিন পরে দেখবেন? পথ চেয়ে থাকেন প্রতীক্ষায়।

হঠাৎ আওয়াজ শুনেন, "মা!”

ভুল শুনলেন? নাকি সত্যিই? তড়িঘড়ি করে বেড়িয়ে আসেন মনোয়ারা বেগম।
“বাপগো! আইছস তুই?” বুকে টেনে নেন ছেলেকে। অনিক টের পায় সিক্ত হয়ে উঠেছে তার দু' চোখের কোণা।

নয়

বড় অরিত্রি গাছটার সামনে একটা জলধারা বয়ে গেছে। তার ওপারে এ জায়গার শেষ দেয়ালগুলোর একটা। ছড়িয়ে থাকা মৃদু আলোটুকু পানির প্রতিফলনে সুন্দর হয়ে ওঠে। হয়ত সন্ধ্যার সময়ে নদীটার মত অপরূপ না, তবে সুন্দর। এখানে মায়ার সবচেয়ে পছন্দের জায়গা এটা। গাছটার নিচে একটু বিশ্রাম নেয় পানি আনার মাঝে। আজকের জন্য এটা মায়া আর নীরার কাজ।

মায়া ভাবছিলো সে দিনটার কথা। কী এক অদম্য কৌতুহল তাকে টেনে নিয়ে গেছিলো এক নীল আলোর দিকে। 'ফেরার পথ নেই' শুনেছিলো মায়া। কিন্তু 'না ফেরা' মানে কী, তা বুঝেছিলো কি? বুঝলে কি আসতো এখানে?

সময়ের হিসেব রাখা কঠিন এখানে। তবে মায়া বুঝে, অনেক বছর চলে গেছে সেদিনের পর। নতুন জীবনে অবশ্য অনেকখানিই মানিয়ে নিয়েছে এতদিনে। এখানেও সবাই মায়াকে তাদের একজন করে নিয়েছে। নীরার সাথে সুন্দর একটা বন্ধুত্ব হয়েছে। কিন্তু সবসময় মা-বাবা, ভাই, দাদী আর সবার কথা খুব মনে পড়ে। মায়ের চেহারা যেন কেমন ছিলো? স্মৃতিতে যেন ধুলো পড়েছে। সবটুকু মনে করতে পারে না মায়া। তবে এটুকুতে ভুল নেই, তার মায়ের মত সুন্দর আর কাউকে সে দেখেনি। আর কি কখনো মাকে দেখতে পারবে মায়া? মা কি এখনো তাকে খুঁজে ফিরে? জানে না সে।

নীরার দিকে তাকায় মায়া। নীরার জন্ম এখানেই। এই জায়গাটা মাটির নিচে কোথাও- এটাই ধরে নিয়েছে তারা। যদিও নিশ্চিত জানে না নীরা- জানার সুযোগও নেই। এটা জানে ওপরে এক বিস্তৃত পৃথিবী আছে। তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু মায়া এসেছে সেখান থেকেই। নীরারও কোন পূর্বপুরুষ এসেছিলো ওপর থেকে। এখানে যারা একবার আসে, তারা কখনো ফিরে যেতে পারে না। ফিরে যাওয়ার কোন দরজা নেই।

দু'চোখ বন্ধ করে নীরা কী যেন অনুভবের চেষ্টা করছে। আনোয়ার চাচা বলেছিলেন, শক্তি ছড়িয়ে আছে সবদিকে। প্রত্যেকটা মানুষই সেটা বুঝতে পারে যদি গভীরভাবে মনোযোগ দেয়। মায়া চোখ বন্ধ করে চেষ্টা করে দেখেছে। অন্ধকার ছাড়া কিছু দেখতে পায়নি।

“মনে হচ্ছে, একটু অন্যরকম," চোখ খুলে বললো নীরা।
“অন্যরকম?”
“হ্যা। আনোয়ার চাচা হয়ত বলতে পারবেন। খাওয়ার পর জিজ্ঞেস করতে হবে।"

খাওয়া দাওয়ার আয়োজন একসাথে এখানে। একদম ছোট আর বয়স্করা বাদে বাকিদের কাজ ভাগ করা থাকে। এখানকার খাবারে মানিয়ে নিতে একটু কষ্ট-ই হয়েছে মায়ার। তবে সবাই একসাথে খাওয়ার মধ্যে একটা তৃপ্তিও আছে।

খাওয়া শেষে আনোয়ার চাচার সাথে দেখা করে মায়া আর নীরা। আনোয়ার হোসেন অনেক বছর আগে এসেছিলেন। ওপরের পৃথিবী নিয়ে ভালো জানেন। এখানে আসার পর এখানকার পৃথিবীকেও জেনেছেন যতটা পেরেছেন। নীরা আর মায়ার কাছে তিনি শিক্ষকের মত।

“আনোয়ার চাচা, শক্তিতে কোন কিছু মনে হয়েছে আপনার?” নীরা জিজ্ঞেস করলো।

“হ্যা, খেয়াল করেছি” বললেন আনোয়ার চাচা, “ওপরের পৃথিবীতে শক্তির ব্যবহার বাড়ছে মনে হয়।" একটু বিরতি নিলেন, “দরজাটা হয়ত আবার খুলবে।"
“ওপারের দরজা?” মায়া জিজ্ঞেস করলো।
"হ্যা।”

দশ

মায়ার হারিয়ে যাওয়ার কয়েকদিন পর। খোঁজাখুজি প্রায় থেমে গেছে ততদিনে। সবাই মেনে নিয়েছে, মায়া আর ফিরবে না। শুধু একটা পরিবার বাদে। দাদী সেসময়ে বিভিন্ন রোগে শয্যাশায়ী, কী হচ্ছে খুব বেশি বুঝতেন না। কিন্তু মা তখনো আশায় বুক বেঁধে রাখতেন। বাবা খোঁজ করে বেড়াতেন যেভাবে যত জায়গায় পারেন। আর অনিক পড়ন্ত দুপুরগুলো কাটিয়ে দিতো পাহাড় থেকে পাহাড়ে খুঁজে। নদীর ধারে। লুকনোর মত যত জায়গা আছে সবখানে।

তারপর যখন সন্ধ্যা নামতো, ক্লান্ত দিনের শেষে বসে থাকতো নদীর ধারে। সূর্যটা যখন নদীতে ডুব দিতো, রক্তিম লাল আকাশটা যেন অনিকের হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠতো। নীড়ে ফেরা পাখিদের কোলাহলের মাঝে যেন ফুটে উঠতো কোন বিষাদের সুর।

আজ বহুদিন পর গোধূলি লগ্নে রাফি আর রাহাতের সাথে নদীর তীরে অস্ত যাওয়া সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়ে সেই দিনগুলো মনে পড়ে অনিকের। বড্ড মায়াবি, বড্ড আপন মনে হয় আকাশটা। কতদিন এভাবে সূর্যাস্ত দেখা হয়নি!

“কতদিন পর একসাথে, তাই না?” দূরে উড়ে চলা এক ঝাঁক পাখির দিকে তাকিয়ে বললো রাহাত।
“হ্যা...” অনিক বলে। একটু থেমে রাফির দিকে ফিরে , “রাফি, তুই কী করছিস এখন?”

“করিম চাচার দোকানে মেকানিকের কাজ শিখছি। গ্রামে বিদ্যুৎ আসতে শুরু করেছে। দোকানগুলোতে রেডিও চলে। কয়েকদিন পর টিভি, ফ্রিজ, টেলিফোন সবই বাসায় বাসায় চলে আসবে। মেকানিকের দাম থাকবে তখন।" জবাব দেয় রাফি।

অনিকের শহরের কথা মনে পড়ে। বিদ্যুৎ বাতি, ফ্যান, টিভি কতরকম আয়োজন। কোন কিছুর অভাব নেই। অথচ তার মাঝে কী যেন নেই। যান্ত্রিক শহরের ইট-পাথরগুলোর মাঝে হৃদয় যেন কোথায় চাপা পড়ে যায়। গ্রামটাও কি শহরের মত হয়ে যাবে ধীরে ধীরে?

“শহরে কেমন কাটে তোর?” রাফি প্রশ্ন করে।
“শহরে? ভালো... মানে, সবকিছুই আছে। পড়াশোনা করছি। ক্লাসমেটদের সাথে সম্পর্কও ভালো। কিন্তু... জানি না, কী যেন একটা নেই। মনে হয় খুব- একা...”

কিছুক্ষণ কোন কথা বলে না কেউ। সূর্যটা ডুবে গেছে ততক্ষণে। নীড়ে ফেরা পাখিদের কোলাহলও থেমে পড়েছে।

“চল উঠি,” অনিক বললো। উঠতে উঠতে মনের অজান্তে কিংবা পুরনো কোন অভ্যাসে একটা ইটের টুকরো কুড়িয়ে নিয়ে নদীতে ছুঁড়ে দিলো সে। পানিতে তিনবার লাফিয়ে খেয়ে ডুবে গেলো ওটা। রাহাতও দেখাদেখি একটা টুকরো ছুঁড়ে দেয় নদীতে। ওটা পাঁচবার লাফালো ডুবে যাওয়ার আগে। রাফিও একটা ইট ছুঁড়ে দিলো। কোন ড্রপ না খেয়ে সোজাসুজি ডুবে গেলো ওটা।

“ধুর ছাতা!” বিরক্তি রাফির কন্ঠে, "এত বছরেও কপাল বদলালো না।" রাহাত হেসে উঠলো। অনিকও হাসলো।
"নদীতে ঢেউ কেমন অগোছালো না আজকে?” অনেকটা আত্মপক্ষ সমর্থনের মত শোনালো রাফির কথা।

"অজুহাত খুঁজিস না," রাহাত জবাব দিতে দেরি করলো না।

অনিক কিছু বললো না। আসলেই কি নদীর স্রোতটা অন্যরকম আজ?

এগারো

“স্যার, আপনি শুরু করতে পারেন," সামনে থেকে সাংবাদিকদের একজন বললো।

চশমাটা ঠিক করে নিলেন অধ্যাপক আজমত। তারিখ কত যেন আজকে? কাল কি তার ছোট ছেলের রেজাল্ট দেয়ার কথা? ভালো রেজাল্ট হলে একটা সাইকেল উপহার চেয়েছিলো ছেলেটা। আচ্ছা, ওসব কথা মনে আসছে কেন এখন? হাতের কাগজটার দিকে তাকালেন, তাতে কিছু লিখে নিয়ে এসেছেন তিনি।

"হ্যা, আপনারা যেমনটা শুনেছেন, প্রাথমিকভাবে গ্রাভিটির কিছু আনএক্সপেক্টেড রিডিং আমরা পেয়েছি, এটা সত্য।" একটা মৃদু গুঞ্জন শুরু হলো প্রেস রুমজুড়ে। অধ্যাপক বলে চললেন, "তবে আমি এবং আমার কলিগরা খুব সতর্কভাবে এটা নিয়ে কাজ করেছি। আমরা নিশ্চিত করছি, আতঙ্কের কিছু নেই। এটা কিছুদিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। সাধারণ জীবনে কোন প্রভাব পড়বে না।"

“স্যার, এটার কারণ কি বুঝতে পারছেন আপনারা?” সাংবাদিকদের দিক থেকে কেউ প্রশ্ন করলো।

“আমরা ধারণা করছি পৃথিবীর অরবিটে কোন আনডিটেক্টেড অবজেক্ট থাকতে পারে, যেটা আমাদের স্যাটেলাইটগুলোতে এখনো ধরা পড়েনি। তবে সেটা হলেও আকারে খুবই ছোট হবে। আবারো, ভয় পাওয়ার মত কিছু নেই।" কন্ঠ কি একটু কাঁপছে অধ্যাপকের? একটু থামলেন তিনি। "আমি আর কোন প্রশ্ন নিতে চাচ্ছি না।"

“স্যার, স্যার, শুধু আরেকটা প্রশ্ন। ভয়ের কথা বলছেন। কোন কিছু কি আশঙ্কা করছিলেন আপনারা?”

“দেখুন, কাজের সময়ে অনেক কিছু চিন্তা করতে হয়। তবে আমি নিশ্চিত করছি, এখানে সেরকম কিছুর আশঙ্কা নেই।"

"স্যার, স্যার," আরো কিছু গুঞ্জনের মত আসতে থাকলো সাংবাদিকদের দিক থেকে। অধ্যাপক আজমত সে গুঞ্জন অগ্রাহ্য করে কনফারেন্স রুম থেকে দ্রুত পায়ে বের হয়ে করিডোরে এসে দাঁড়ালেন। একটানা মিথ্যা বলতে বলতে ক্লান্ত তিনি।

তার গবেষণা ভুল না হলে একেবারে মৌলিক বলগুলোতে পরিবর্তন আসছে। এখনো যন্ত্র ছাড়া না ধরার মত, তবে পরিবর্তন দ্রুত বাড়ছে। এর পরিণতি জানেন না তিনি। তবে জানেন কিছুদিনের মধ্যে মানুষ টের পেতে শুরু করবে। আর যদি এভাবেই চলতে থাকে, তবে পৃথিবীতে ক্রমশ কঠিন থেকে কঠিন দুর্যোগ নেমে আসবে। কয়েক মাস পর প্রাণের অস্তিত্ব ধারণের মত থাকবে না পৃথিবী। তবে রিপোর্টে সেসব লিখেননি তিনি। প্রেস কনফারেন্সের মতই একগাদা মিথ্যে ঠেসে দিয়েছেন। সাধারণ চোখে ধরা পড়বে না সেসব, তবে হয়ত খুব অভিজ্ঞ কোন চোখকে তিনি ফাঁকি দিতে পারবেন না।

কেন? নিজেকে প্রশ্ন করেন অধ্যাপক। তার দুই ছেলের চেহারা চোখের সামনে ভাসছে। প্রেসের সামনের দিকে থাকা তরুণ সাংবাদিকদের চেহারাগুলো যেন চাবুকের মত আঘাত করছে। নিজেকে বিশ্বাসঘাতক মনে হচ্ছে। কিন্তু সত্যটা বলার ক্ষমতা তার নেই। কেন নেই? হয়ত শত শত স্বপ্নের ভেঙে পড়া দেখার সাহস করতে পারেননি, তাই। কিন্তু যদি স্বপ্ন আর আশাগুলো যদি শুধু মরীচিকা হয়, তবে? জানেন না অধ্যাপক। শুধু এটুকু জানেন, যে ওজন তিনি শুধু নিজের করে নিয়েছেন, তা নেয়ার ক্ষমতা তার নেই।

'হয়ত! হয়ত সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে,' নিজেকে বুঝ দিলেন যেন।

“স্যার, কিছু বললেন?” করিডোরে অপেক্ষা করা ল্যাব অ্যাসিস্টেন্ট রহমত জিজ্ঞেস করলো।

“না, ড্রাইভারকে বলো গাড়ি নিয়ে আসতে।"

কিছুই কি করার নেই? অধ্যাপক জানেন না। প্রকৃতির কাছে মানুষ বড্ড অসহায়। গবেষক হিসেবে তার কাজ প্রকৃতির নিয়ম বোঝার সাধনা করা, সে নিয়মকে কাজে লাগানো। কিন্তু প্রকৃতি যদি তার নিয়ম বদলে ফেলে? তখন কি করার থাকে একজন গবেষকের?

বারো

পাহাড়ের ওপরে নীলাভ আলো। মন্ত্রমুগ্ধের মত ওদিকে এগিয়ে যেতে থাকে অনিক। হঠাৎ সে আলো অনিককে ঘিরে নেয় চারিদিক থেকে। ঘুম ভেঙে যায় অনিকের। খোলা জানালা দিয়ে চাঁদটাকে দেখা যাচ্ছে। ওদিকে হাত বাড়ায় অনিক। কিন্তু চাঁদটা অনেক দূরে। স্পর্শের বাইরে। কোথায় থেকে যেন ঝিঁঝি পোকাগুলো ডেকে চলে একটানা।

সেই দিনটার কথা মনে করার চেষ্টা করে অনিক। দুপুর পর্যন্ত সবকিছু ছিলো আর সব দিনের মতই। মায়া বায়না ধরছিলো পাহাড়গুলোতে ঘুরতে যাওয়ার। অনিক বলেছিলো বিকালে নিয়ে যাবে। কিন্তু বিকাল হতে হতে মায়াকে আর পাওয়া গেলো না। বাসার আশেপাশে, পুকুরপাড়ে, কিংবা যে পুরোনো ভাঙা বাড়িটাতে মায়া লুকিয়ে থাকতে পছন্দ করত- সব জায়গা কত করে খোঁজা হলো। আস্তে আস্তে পুরো গ্রামটাই যেন খুঁজতে লেগে পড়লো। কিন্তু কোন চিহ্নও যেন পাওয়া গেলো না।

কোথায় হারিয়ে গেলো মায়া? সবচেয়ে সহজ উত্তরটা ভাবতে পারে না অনিক, এতগুলো বছর পরেও না। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণ সম্ভাবনাগুলো ভাবতে থাকে। শহরের দিকে পাড়ি দিয়েছে

কাউকে না বলে? কিংবা নদীর ওপারে কোথাও? তারপর পথ হারিয়েছে? এখনো কি বাসার পথ খুঁজে ফিরছে? কিংবা হয়ত... হয়ত সেই লোককথাগুলো শুধুই গল্প ছিলো না।

স্বপ্নটার কথা মনে করে। কেন বারবার আসে স্বপ্নগুলো? কোন বার্তা দিতে চায়? নাকি শুধুই মনের অব্যক্ত যন্ত্রণাগুলো স্বপ্ন হয়ে আসে? বুঝে না অনিক। তবে এটুকু বুঝে আজ আবারো পাহাড়গুলোতে বের হবে সে। যে পথে শতবার নিরাশ হয়েছে, সে একই পথে আবারো খুঁজে ফিরবে। এটুকু বুঝে, যদি এই পৃথিবীর কোথাও মায়া থেকে থাকে, অনিক তাকে খুঁজে বের করবেই।

তেরো

সিরাজ মাস্টার- এক নামে চিনতো একসময় পুরো গ্রাম। সাদাসিধে জীবন চালিয়েছেন। কিন্তু স্কুলের হেডমাস্টার হিসেবে সমাজে সম্মান ছিলো আলাদা। আজ বয়সের ভারে নুয়ে পড়া শরীর নিয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে চলার সময় স্মৃতিগুলো যেন উপহাস করে তাকে। তবে চোখদুটোতে জ্ঞানের দ্যুতি ছেড়ে যায়নি এখনো।

ছেলেমেয়ে শহরে। সারা জীবনের সঙ্গী আসিয়া বিবি শুধু এখনো পাশে আছেন, যেমন ছিলেন সব সুখ-দুঃখের দিনে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধার নিঃসঙ্গ সংসার। অবসর নেয়ার পর ছাত্রছাত্রীরা আগে মাঝে মাঝে দেখা করতে আসতো। অনেকদিন কেউ আসেনা।

দরজায় কেউ কড়া নাড়ে তখন। "স্যার, আছেন?”

ধীরে ধীরে লাঠি ঠুকে চলে দরজা খুলে দেন সিরাজ মাস্টার।

“কী খবর বাবা? নামটা যেন কী তোমার?”

“অনিক।"

ঠিক মনে করতে পারেন না সিরাজ মাস্টার, অবশ্য সেটা প্রকাশ করেন না।

“অনিক। হ্যা, বাবা। ভেতরে আসো। বসো।"

অনিক ভেতরে ঢুকে। সিরাজ মাস্টার একটা চেয়ারে বসতে দেয় তাকে। নিজে বিছানাতে বসেন। অনিক চারিদিকে দেখে। তাকভর্তি বই, ক্রেস্ট, সনদপত্রগুলো আগের মতই আছে। শুধু ধুলো জমেছে।

“বাবা, কিছু বলতে চাচ্ছিলে?”

“স্যার, এমনি দেখা করতে আসলাম।... আর স্যার, গ্রামের পুরনো গল্পগুলো নিয়ে একটু জানার ছিলো। ভাবলাম, আপনি হয়ত ভালো জানবেন।"

“পুরনো গল্প?” বৃদ্ধ একটা উৎসাহ বোধ করেন। একটু লম্বা আলাপের জন্য প্রস্তুতি নেন, আসিয়া বিবিকে ডাকেন, “কইগো, একটু চা বসায়ো তো চুলায়।" আবার অনিকের দিকে ফিরেন, “বলো বাবা, কী জানতে চাও।"

“স্যার, গল্পগুলো কীভাবে আসলো আসলে?”

“কীভাবে আসলো এইটা তো বাবা বলা কঠিন। অনেককাল ধরে চলে আসতেছে। তোমার দাদার দাদাও বোধহয় শুনেছে এইসব। তবে বাবা, এই কিসিমের গল্প শুধু এই গ্রামে না, সবখানেই আছে। মানুষ যেইটা বুঝে না, সেইটা নিয়েই গল্প বানায়। তারপর মুখে মুখে চলতে থাকে।"

“স্যার, দাদী একটা গল্প বলতেন। মাটির নিচে একদল মানুষ থাকে। সেখানে গেলে আর ফিরে আসা যায় না।"

পুরনো দিনের কথা মনে করে হাসলেন বৃদ্ধ। একসময় তিনিও কত খুঁজেছেন সে জগতের দরজা। হাসিটা অবশ্য বিষাদে রূপ নিলো দ্রুতই। একটা হারানোর বেদনা অনেকদিন পর আবারো মনকে ভারি করে দিলো।

“হ্যা বাবা, আমিও শুনেছি ছোটবেলায়।" একটু থামলেন। "মানুষ বলে, অনেক বছর আগে বড় একটা বিপর্যয় নামে এখানে। নদীতে উথাল-পাথাল ঢেউ শুরু হয়। মাটি যেন পাথর হয়ে যায়। এর মধ্যে একদিন ভয়ানক ঝড় নামে। সে রাতে পাহাড়ে আলো দেখা যায়। একদিন, দুইদিন, তিনদিন- ঝড় চলতে থাকে।"

মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকে অনিক। বৃদ্ধ বলতে থাকেন, “তারপর একদিন একজন সাহস নিয়ে এগিয়ে যায় সেদিকে। সে আর ফিরে আসে না। আরো দুয়েকজন এগিয়ে যায় তার খোঁজে। কেউ ফিরে না। কিন্তু একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে, ঝড় থামে না, কিন্তু ঝড়ের তেজ কমে। গ্রামের বয়স্করা তখন বলেন, ‘মাটি তার পাওনা বুঝে নিলেই শুধু এই ঝড় থামবে।' তারপর আরেক যুবক এগিয়ে যায় সেখানে। সেও কখনো ফিরে না। কিন্তু ঝড় থেমে যায় সে রাতে। নীল আলো আর দেখা যায় না।"

“কী হয়েছিলো তাদের স্যার?”

“কী হয়েছিলো? কেউ জানে না। অনেক গল্প অবশ্য আছে। কেউ বলে মাটি নিয়ে নিয়েছে তাদের। কেউ বলে ওটা অন্য কোন জগতের দরজা।"

একটু থামেন বৃদ্ধ। বলবেন কি বলবেন না ভাবেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, “একসময় আমিও পাহাড়গুলো খুঁজে বেড়িয়েছি, জানো? চল্লিশ বছর আগে, আমার এক বন্ধু হারিয়ে গিয়েছিলো। আনোয়ার।"

“তাকে আর পাওয়া যায়নি স্যার?”

“না। তবে আমার খুব মনে আছে, আনোয়ার হারিয়ে যাওয়ার আগে নদীতে কদিন উথাল-পাথাল ঢেউ খেলছিলো। আর... ঝড় নেমেছিলো সেদিন।"

নির্বাক হয়ে যায় অনিক। হেডমাস্টার নিজেই বলেন, “অবশ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগও তো হয়, তাই না?”

“জ্বী, স্যার।"

বৃদ্ধের দৃষ্টি যেন কোন সুদূরে কোথাও। হঠাৎ যেন মনে পড়ে তার, “অনিক... না? তোমার বোন মায়া হারিয়ে গেছিলো, তাই না?”

“জ্বী, স্যার।" আবারো এটুকুই বলে অনিক।

বৃদ্ধ মাথা নাড়েন। বুঝে নেন অনেক কিছু। আসিয়া বিবি ট্রে-তে করে কিছু বিস্কুট আর চা নিয়ে আসেন।

... ...

পাহাড় থেকে পাহাড়ে ঘুরে অনিক কাটিয়েছে পুরোটা দিন। ক্লান্ত-অবসন্ন দেহ। তবু সে রাতে ঘুম হয় না অনিকের। সিরাজ স্যারের কথাগুলো মাথায় ঘুরতে থাকে। যদি গল্পগুলো শুধু গল্প না হয়, কেউ কখনো ফিরে না সেখান থেকে। কিন্তু সে নীল আলো হয়ত আবার দেখা যাবে। আর তখন... শুধু তখন আবারো কেউ যেতে পারবে সে জগতে।

সেদিনের দেখা নদীর কথা মনে পড়ে। আসলেই কি ঢেউগুলো এলোমেলো ছিলো সেদিন? আরো কি উত্তাল হবে নদী, ফিরে আসবে সে আলো? যখন পৃথিবীকে অনাগত দুর্যোগ

থেকে বাঁচাতে কাউকে না কাউকে সব ছেড়ে যেতে হবে সে অজানার উদ্দেশ্যে? সেজন্যই কি অনিকের গ্রামে ফেরা এত বছর পর?

অবান্তর ভাবনা- বোঝে অনিক। আবার মনে হয় সৃষ্টিকর্তা যদি তার ভাগ্য সেভাবেই লিখে থাকেন, অসম্ভব কী তবে? তবে একটা জায়গায় অঙ্কটা মেলে না অনিকের। মায়া হারিয়ে যাওয়ার সময় তো কোন দুর্যোগের কথা মনে পড়ে না!

চৌদ্দ

পরেরদিন। আজ আবারো নদীর ধারে বন্ধুদের সাথে সূর্যাস্ত দেখতে এসেছিলো অনিক। জানতো না, বড় চমক অপেক্ষা করছে তার জন্য।

"এত ঢেউ আজ নদীতে!" রাহাতের কন্ঠে বিস্ময়। বিস্মিত রাফিও।

তবে ওদের বিস্ময় অবশ্য অনিকের বিস্ময়ের কাছে কিছুই না। কথা বলার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলে কিছুক্ষণের জন্য।

অনেকক্ষণ পর ধীর কন্ঠে বলে অনিক, "সিরাজ স্যারের সাথে দেখা করেছিলাম গতকাল।"
"সেই ক্লাস ওয়ানের সময়ের হেডমাস্টার?" অনিকের দিকে ঘুরে তাকায় রাফি।
"হ্যা। উনার বন্ধু আনোয়ার হারিয়ে গেছিলেন চল্লিশ বছর আগে।"
"কিন্তু এখন এই কথা কেন?" রাফি ঠিক বুঝতে পারলো না। রাহাতের চোখেও প্রশ্ন।
"তার আগে কয়েকদিন নাকি নদীতে ঢেউ উত্থাল-পাথাল ছিলো।"
"মানে?" বুঝলো না রাফি।
"জানি না।" দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো অনিক।

উত্তাল ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে অনিকের রহস্যঘেরা কথাগুলোর মানে অবশ্য রাহাত ঠিকই বের করে নেয়। মায়ার কথা তার অজানা না। আর এই গ্রামের লোককথাগুলোও না।

পনেরো

তিনদিন পর। অনিকের ছুটি শেষের পথে, শহরে ফেরার সময় আসছে। কিন্তু একটা রহস্য, অথবা একটা চেপে রাখা ব্যথা তাকে গ্রামে বেঁধে রেখেছে। আরো নির্দিষ্টভাবে বললে পাহাড়গুলোতে। একটা নীল আভার খোঁজে।

“অনিক!”

একটা ডাক শুনে তাকায় অনিক, “রাহাত! এখানে হঠাৎ?”

“জানতাম তোকে এখানে পাবো।" জবাব দেয় রাহাত। একটু থামে, "এখনো...?”

“হ্যা।"

নীরব সঙ্গ দেয় রাহাত। নীল আলোর দেখা মেলে না। হঠাৎ পূর্ব আকাশে মেঘ জমে। তারপর ফোঁটায় ফোঁটায় নেমে আসে জলধারা।

শিহরণ বয়ে যায় অনিকের শিরদাঁড়ায়। নতুন উদ্যমে চারিদিকে তাকায়। বৃষ্টি? গায়ে লাগে না। রাহাত জানে না এর কোন অর্থ আছে কিনা। তবু সঙ্গ দিয়ে যায়। দুজনে খুঁজে দেখে পাহাড়গুলোর যত জায়গা তাদের জানা। এক নীলাভ আলোর খোঁজে।

ষোল

অনিকের মা-বাবা ঘুমিয়ে পড়েছেন ততক্ষণে। তবে অনিক জানে, আজ রাতেও চোখে ঘুম আসবে না তার। জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে একটানা ঝরে পড়া বারিধারার দিকে। সবকিছুই সেই গল্পের মত, শুধু নীল আলোটুকু নেই। সিরাজ মাস্টারের শেষ কথাটা কানে বাজে 'অবশ্য প্রাকৃতিক দুর্যোগও তো হয়, তাই না?'

সে আলোর দেখা পেলেই বা কী করত অনিক? চলে যেত? বাবা-মা, বন্ধুরা আর সবাইকে ছেড়ে? হয়ত পৃথিবীর নিয়ম, কেউ হারিয়ে গেলে হারিয়ে যেতে দিতে হয়। তাকে ফেরানোর নিয়ম হয়ত নেই। জানে না অনিক। বুক ভাঙা চিৎকার করতে ইচ্ছে হয়। পারে না।

চোখ বন্ধ করার চেষ্টা করে অনিক। কিন্তু তখন আরেকটা কথা মনে হয়। দাদীর গল্পে রাতের কথা ছিলো। এমন না তো সেই আলো শুধু রাতে দেখা যায়? অনিক ভাবনাটা বাদ দিতে চায়। বোঝানোর চেষ্টা করে নিজেকে, গল্প শুধুই গল্প। বোঝাতে পারে না। খুব সন্তর্পণে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। এই বৃষ্টির রাতে।

সতেরো

পরদিন সকাল।

বাদল ধারা ঝরে চলেছে তখনো। ছাতায় আটকায় না পুরোপুরি। অনিককে পাহাড়ের দিকে পায় না রাহাত। হৃদয়ে একটা অশনিসংকেত বয়ে যায়। কাদাভেজা রাস্তায় হাঁটা দেয় অনিকের বাড়ির দিকে।

বাড়ির সামনে রাহাত দেখা পায় অনিকের। অনিকের চেহারায় অনেককিছু যেন একসাথে চলছে। রহস্যের টান, কিংবা উত্তেজনা? রাহাতের পড়তে সময় লাগে। তারপর বুঝতে পারে সবকিছু ছাপিয়ে অনিকের ঘুমহীন চোখগুলোতে ফুটে উঠেছে ভয়। প্রচন্ড ভয়।

“রাহাত,” কথা বলে অনিক, “নীল আলোটা আমি দেখেছি।"

"দেখেছিস!” রাহাত যেন বিশ্বাস করতে পারে না।

“গতরাতে পাহাড়ের দিকে আবারো গেছিলাম,” অনিক বলে চলে, "ওখানে কিছু ছিলো না।"

রাহাত কোন প্রশ্ন করে না। মনে যদিও অনেক প্রশ্ন। ছাতাটা নামিয়ে রাখে মাথা থেকে। বৃষ্টির ফোঁটা ভিজিয়ে চলে দুজনকেই।

বলতে থাকে অনিক, “পাহাড়ে যদি আলো থাকতো, তাহলে অনেকেই দেখতো। কিন্তু মায়ার সময় আর কেউ দেখেনি। সিরাজ স্যারও তেমন কিছু বলেননি। তাছাড়া মায়া একা পাহাড়ের দিকে যাওয়ারও কথা না।"

অনিক দম নেয়। "মায়া আমাদের বাসার পেছনের ভাঙা বাড়িটাতে লুকিয়ে থাকতে ভালোবাসতো। ওখানে ছিলো আলোটা।"

“অনিক!” অবশেষে কথা বলে রাহাত, “তুই জানিস না ওই আলো কোথায় নিয়ে যাবে।" আকুতি ঝরে পড়ে রাহাতের কন্ঠে, “এমন কিছু করিস না... এমন কিছু করিস না যার ভার সবার ওপর পড়বে।"

“রাহাত, যেতে হবে আমাকে।" শান্ত কন্ঠে বলে অনিক।

“পাগলামি করিস না অনিক। তুই জানিস না মায়া ওখানে আছে কিনা।"

“তাও যেতে হবে। এই বৃষ্টি, ঝড়, নদীর উত্তাল স্রোত নয়ত থামবে না। কাউকে না কাউকে যেতে হবে... আমাকে যেতে হবে।"

“অনিক, বোঝার চেষ্টা কর। আন্টি-আঙ্কেল মায়াকে হারিয়েছে। তোকে হারালে তাদের কী হবে ভাব।"

অনিক ভেবেছে। অনেক ভেবেছে। কিন্তু শুধু মায়ার জন্য না। এই বৃষ্টি, এই স্রোত যদি না থামে, তবে পুরো গ্রামে বিপর্যয় নামবে। এই গ্রামের জন্য, তার সবচেয়ে কাছের মানুষদের জন্য অনিককে যেতে হবে।

“অনিক, কী ভাবছিস?”
জবাব দেয় না অনিক।

“অনিক, শোন। তুই যদি যাস, তাহলে একসাথে যাবো আমরা। আর যদি ফিরে আসার কোন পথ থাকে, যত কঠিন হোক, একসাথে ফিরে আসবো।" ঘোষণা দেয় রাহাত।

“রাহাত,” ধীর কন্ঠে বলে অনিক। "তোকে থাকতে হবে। আমার মাকে বলার জন্য তোকে থাকতে হবে।"

“অনিক, শুধু গল্প ওগুলো। তুই কেন এভাবে নিচ্ছিস?” রাহাতের গলায় আর্তনাদ।
“গল্প হলে তো ভয়ের কিছু নেই। নীল আলোর দিকে গেলে হয়ত কিছুই হবে না।" অনিক হাসার চেষ্টা করলো আকাশের দিকে তাকিয়ে। অবিরত বৃষ্টির ধারা তখনো বলে চলেছে, সব গল্প শুধু গল্প না।

আঠারো

“নীরা, কখনো যদি ওপরের পৃথিবীতে যেতে পারতে, যেতে?” প্রশ্ন করে মায়া।
“অবশ্যই! এখানে ইচ্ছে করে থাকে কে?” নীরা জবাব দেয়। যে পাখি অপার আকাশের কথা জানে, যত আয়োজনই থাকুক, খাঁচার মাঝে সে কি সুখ খুঁজে নিতে পারে?

“কিন্তু যদি তোমার বাবা-মা, আর এখানের সবাইকে ছেড়ে যেতে হত? একেবারে?” মায়া আবারো প্রশ্ন করে।

এই প্রশ্নের জবাব দেয় না নীরা। জবাব কী দিবে জানে না সে।

“দরজাটা আবার খুলবে, না?" আরেকবার প্রশ্ন করে মায়া।

“হয়ত... অথবা হয়ত খুলে গেছে," নীরা উত্তর দেয়।

"আরেকজন আসবে কয়েকদিনের মধ্যে। সবকিছু ছেড়ে...” সবসময় প্রাণবন্ত মায়ার কন্ঠ অনেক গভীর শোনায়।

উনিশ

ঘুম থেকে উঠলেন অধ্যাপক আজমত। ঘড়ির কাঁটা বারোটার দিকে। রুটিন বাঁধা জীবনে এমন অনিয়ম বিরল। দীর্ঘ ঘুমের পরও পরিশ্রান্ত লাগে তার। চারতলার জানালা থেকে বাইরের কোলাহল চোখে পড়ে- সবসময়ের মত। সামনে গতদিনের পত্রিকা। শেষপাতায় ছোট করে একটা খবর। ছোট ছোট কিছু অসামঞ্জস্যের কথা বলছেন অনেকে। দোলনাটা একটু যেন বেশি দুলছে, কিংবা পোষা কুকুরটা হঠাৎ কেমন যেন করছে অথবা হুট করে অসময়ে বৃষ্টি এমন সব কথা। অধ্যাপক আজমত শুধু জানেন ছোট্ট এই জিনিসগুলো খুব বড় কিছুর সংকেত। কিন্তু জানেন না তার কী করার আছে। ক্লান্ত তিনি। আবারো চোখ বুজেন।

বিশ

বিষণ্ন বৃষ্টি ঝরে চলে। বাইরে হাঁটু সমান পানি জমেছে। দু'দিন ধরে কাজে যাওয়া হয়নি রাফির। ঘরেই কাটছে। একটা রেডিও হাতে। ঠিক করার জন্য দোকান থেকে নিয়ে

এসেছিলো। এখনো তত হাত পাকেনি। সমস্যাটা ধরতে সময় লাগে। শেষে বুঝে এন্টেনার কানেকশনটা ঠিকঠাক নেই। নতুন একটা তার লাগায় সেখানে।

ঝিরিঝিরি শব্দের মাঝে রেডিওর আওয়াজ আসতে শুরু করে, আবহাওয়ার পূর্বাভাসে... ভারী বৃষ্টি... বন্যা সতর্কতা... কয়েকটা শব্দ বোঝা যায়।

একুশ

পরের দিন। পড়ন্ত দুপুরবেলা। অবশ্য সব বেলা এখন এক হয়ে গেছে। বৃষ্টি থামেনি। বেড়েছে। ঝড়ের দিকে যাচ্ছে। অনিক জানে ঝড় থামবে না। মা-বাবা একটু বিশ্রাম নেন এসময়। অনিক ঠিক করে এই সময়টাতেই বেরিয়ে পড়তে হবে। মা-বাবাকে নিঃশব্দে শেষবারের মত একবার দেখে নেয়।

বাইরে এসে রাহাতের দেখা পায়। সত্যি বলতে অনিক বুঝছিলো হাঁটুপানি পেরিয়ে হলেও রাহাত থাকবে এখানে। বিষণ্ন হাসি হাসে অনিক।
"সত্যিই যাবি?" বলে রাহাত।

মাথা ঝাঁকায় অনিক। রাহাত বাঁধা দিতে চায়। কিন্তু মনে হয় কেউ যদি তার বোনের খোঁজে অজানার পানে পাড়ি দিতে চায়, তবু বাঁধা দেয়ার অধিকার তার নেই। তাই শুধু একটা প্রতিজ্ঞা চায় রাহাত, "কথা দে, যদি ফেরার কোন পথ থাকে, যত কঠিন হোক, ফিরে আসবি।"

"আসবো," বলে অনিক। শুধু বলার জন্য।

দু'জনে এগিয়ে চলে পরিত্যক্ত ভাঙা বাড়িটার দিকে। ভেতরে মৃদু অথচ স্পষ্ট নীল আলো গোল হয়ে জ্বলছে।

“রাহাত, শুধু একটা হেল্প করতে পারবি?” অনিক জিজ্ঞেস করে।
“কী?”
“মাকে বলিস, আমি ঢেউয়ের মধ্যে নদীতে নেমে ডুবে গেছি। তুই যেতে মানা করেছিলি, শুনিনি।"
রাহাত জবাব দেয় না।

নীল আলোর দিকে এগিয়ে যায় অনিক। মা-বাবার চেহারা চোখে ভাসে। রাহাতের চেহারা, রাফির চেহারা। ওদের মুরগিগুলোকে খাবার দেয়ার ছবিগুলো। গ্রামের বাজারটার ছবি। গ্রামটার ছবি। শহরটাকেও হঠাৎ খুব আপন মনে হয়। মনে হয় শহরের ক্লাসমেটরা ক্লাসমেট থেকে কখন যেন বন্ধু হয়ে উঠেছিলো। আবিরের কথা মনে পড়ে, ওর ম্যাগাজিনের গল্পটা আর পড়া হলো না। আরেকজনের কথা মনে পড়ে- যাকে একটা কথা কখনো বলা হবে না...

বাইশ

অধ্যাপক আজমত অবাক বিস্ময়ে দেখেন আজকের গ্রাফগুলো অনেকটা স্বাভাবিক। যেন এতদিনের পরিবর্তনগুলো প্রায় নেই হয়ে গেছে। কাঁধ থেকে বড় একটা বোঝা যেন নেমে যায়। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। প্রকৃতির খেয়াল বড় অদ্ভুত- ভাবলেন তিনি।

“স্যার, চা দিব?” রহমত জিজ্ঞেস করে।
“চা? দেও। চিনি ছাড়া।" বলেন অধ্যাপক।

ঠিক সেসময় একটা মেইল আসে তার কাছে। এক তরুণ বিজ্ঞানীর পাঠানো। সাবজেক্টে লেখা "Unusual Geothermal Energy Distribution Detected in a Remote Area." সাথে একটা হিটম্যাপ। এক জায়গায় তীব্রতা অস্বাভাবিক বেশি। ম্যাপে জায়গাটা দেখলেন অধ্যাপক, পাহাড়ঘেরা একটা গ্রাম আছে সেখানে।

'অদ্ভুত! খুব অদ্ভুত...' স্বগতোক্তি করলেন অধ্যাপক।

তেইশ

ধীরে ধীরে চোখ খুললো অনিক। মনে হয় দীর্ঘ ঘুম থেকে জেগে উঠলো। চারিদিকে দেয়াল ঘেরা। অসম্ভব নিস্তব্ধ। মৃদু একটা হলুদাভ আলো। মানিয়ে নিতে সময় লাগে। ধীরে ধীরে মনে পড়ে এখানে আসার কথা। উঠে বসার চেষ্টা করে অনিক।

"শুয়ে থাকো," একটা মধ্যবয়সী নারী কন্ঠ বললো, "আরেকটু বিশ্রাম প্রয়োজন তোমার। ভয় নেই, তুমি নিরাপদে আছ।"
নির্দেশ মেনে নিলো অনিক।

কন্ঠটা আবার জিজ্ঞেস করলো, "তোমার নাম?"
"অনিক।"
"অনিক... নামটা শুনেছি... মায়ার বড় ভাই তুমি?"
"মায়া!" অনিকের কন্ঠে ব্যাকুলতা, "মায়া এখানে আছে?"
"হ্যা, আমার মেয়ের সাথেই থাকার কথা," হাসলেন ভদ্রমহিলা, "পানি আনতে গেছে বোধহয় ওরা। ফিরলেই দেখা করতে পারবে।"

চব্বিশ

শত শত মানুষের একসাথে খাবার আয়োজন অবাক করে অনিককে। সবার একসাথে কাজ করা, প্রাণবন্ত কথাবার্তা। খুব অল্প সময়েই একটা ব্যাপার বুঝতে পারে- এই সমাজটা তার গ্রামের মত না, শহরের মতও না।

কাছের অল্প কয়েকজন বাদে শহরে সবার সাথে কেমন যেন দূরত্বের দেয়াল মনে হয় একটা। কখনো মনে হয় যেন মুখোশ পড়া কিছু মানুষ। আর গ্রামে? সহজ সরল মানুষগুলোও একটু থেকে একটু বিরোধে কী হয়ে যেতে পারে- দেখেছে অনিক।

কী যেন একটা ভিন্ন এখানে। স্কুলে যে ইতিহাস আর সমাজবিজ্ঞান পড়েছে, তার সাথেও পুরো মেলাতে পারে না। হয়ত এখানকার মানুষগুলো 'সবাই মিলে একা', ভাবে অনিক। তাই বোধহয় একজন আরেকজনকে বুঝে নিতে পারে।

তবে মায়ের হাতের মাংসের তরকারি আর মজার সব খাবারের বদলে পাতার ওপর স্যুপের মত গোলানো অচেনা কিছু সবজির সামনে অনিকের খুব অসহায় মনে হয়। চেষ্টা করে প্রকাশ না করতে। কিন্তু এখানকার একরকম রুটির সাথে মিলিয়ে কিছুটা মুখে তুলে নিতে নিতে চোখেমুখে সে অসহায়ত্ব পুরোপুরিই ফুটে ওঠে।

মায়া খেয়াল করে ব্যাপারটা। হেসে ফেলে। তারপর আরো কয়েকজনের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে সেটা।

“এখানে আয়োজন এমনই বাবা," বলে নীরার মা, “মানিয়ে নেও, কী আর করা।"

“না, আন্টি...,” লজ্জায় পড়ে যায় অনিক।

... ...

এই জগৎটাকে কীভাবে বোঝাবে অনিক? যেন পাথরঘেরা কোন সুরঙ্গপথ। পাথরের কিছু স্তম্ভ অগোছালোভাবে ওপরের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছেছে। তার মাঝে কিছু কিছু ঘর করে নেয়া। আকাশ নেই, সূর্য নেই, চাঁদ-তারা নেই। শুধু একটা হলুদাভ আলো। আলোটা অনিকের দেখা কোন আলোর মত না, কোন উৎস নেই, সবদিকে ছড়িয়ে।

“মায়া,” জিজ্ঞেস করে অনিক, “এই জগতের সাথে শক্তির কী একটা সম্পর্ক আছে বলছিলে?”

“আমিও আসলে বুঝিনা এটা,” মায়া বলে।

জবাবটা নীরা দেয়, “পৃথিবীর শক্তি ঠিক রাখে এই জায়গা। তুমি আনোয়ার চাচার সাথে দেখা কর। উনি সবচেয়ে ভালো বলতে পারবেন।"

আনোয়ার চাচা? চমকে ওঠে অনিক। সিরাজ মাস্টারের সেই বন্ধু!

পঁচিশ

“ওপরের পৃথিবীতে কলকারখানা অনেক বেড়েছে, তাই না?” অনিককে জিজ্ঞেস করেন আনোয়ার চাচা।

“হ্যা,” জবাব দেয় অনিক।

আনোয়ার চাচা মাথা ঝাঁকান, "অনেকদিন ধরে এই জগৎটা নিয়ে ভেবেছি আমি, তবে এখন মনে হয় আমি বুঝতে শুরু করেছি।"

মনোযোগ দিয়ে শোনে অনিক। মায়া আর নীরাও শুনতে থাকে গভীর মনোযোগে।

“শক্তি সবদিকে আছে। যদি তুমি শক্তিকে কাজে লাগাতে চাও, তাহলে শক্তি একত্র করতে হবে। কিন্তু শক্তির ধর্ম ছড়িয়ে পড়া। শক্তি যদি ছড়িয়ে পড়ে তাহলে তৈরি হবে বিশৃঙ্খলা।"

অনিক বিজ্ঞান বইয়ে শক্তি আর তাপগতি নিয়ে পড়েছিলো, তার সাথে মিল আছে বলে মনে হয়। মায়ার কাছে অবশ্য বরাবরই দুর্বোধ্য ঠেকে কথাগুলো। নীরা আগে থেকে একটু একটু বুঝলেও আনোয়ার চাচার কথায় সবসময়ই নতুন কিছু থাকে।

আনোয়ার চাচা বলে চলেন, "শক্তিকে একত্র করতে পারে শুধু একটা বড় শক্তি - প্রাণ। আর প্রাণের মধ্যে শুধু মানুষ শক্তিকে নিজের মত নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। মানুষ প্রতিনিয়ত সেটা করে, বুঝে অথবা না বুঝে।"
তিনি একটু দম নেন মাঝখানে। "কিন্তু ক্ষমতা থাকলে তোমাকে দায়িত্বও নিতে হবে। শক্তির যা খুশি ব্যবহার করলে পৃথিবী ভারসাম্য হারাবে। যখন সেরকম হয়, এই জগতের দরজাটা তখন খোলে।"

হঠাৎ মনে হয় একটু বেশি গভীর কথা হয়ে যাচ্ছে। একটু সহজ হওয়ার চেষ্টা করেন, "আচ্ছা, বেশি কঠিন কথা বলে ফেলছি মনে হয়। বুঝতে পারছো?" অনিকের দিকে ফিরে জানতে চান।

"জ্বী চাচা, বুঝছি। এই জগৎটা কোথায়?" প্রশ্ন করলো অনিক।

"যদি আমার ধারণা ঠিক থাকে, তবে এই জগৎটা সত্যিকার অর্থেই মাটির নিচে কোথাও।" একটু থামলেন আবারো। "এখানের অধিবাসীদের কাজ মাটির নিচে শক্তি জমা করা।"

"শক্তির ভারসাম্য তাতে কীভাবে হয়?"

"ওই যে বললাম, শক্তির ধর্ম ছড়িয়ে পড়া। তোমার কাছে শুধু শক্তি থাকলে হবে না। তোমার আশেপাশে শক্তি তোমার থেকে কম থাকতে হবে। বলতে পারো এই জগতের কাজ আশেপাশের শক্তিকে পুরোপুরি ছড়িয়ে পড়তে না দেয়া।"

“জ্বী চাচা," বোঝার ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে অনিক। প্রথমবারের মত আনোয়ার চাচা একটু হাসেন, “এর সব কিন্তু শুধু আমার অনুমান। হয়ত এর কিছুই ঠিক না!”

"চাচা, আরেকটা প্রশ্ন- নীল আলো, মানে দরজাটা কীভাবে খোলে?”
“কীভাবে? জানি না,” আবার আগের গভীরতা ফিরে আসে আনোয়ার চাচার মুখে, "হয়ত সৃষ্টিকর্তার কোন সৃষ্টিকৌশল। যখন শক্তির ভারসাম্যের জন্য প্রয়োজন হয়, তখনই খুলে দরজাটা।"

তাই কি? সৃষ্টিকর্তা তো যা চান তাই করতে পারেন। কোন মানুষের প্রয়োজন নেই তার। তবে দাদীর বলা একটা কথা মনে আছে অনিকের। তিনি সবকিছু একটা নিয়মের মধ্যে করেন।

ছাব্বিশ

বৃষ্টি ধীরে ধীরে থেমে আসে। সন্ধ্যা পেরিয়ে আঁধার নামতে শুরু করেছে। অনিকের মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে কী বলবে বুঝে না রাহাত। বুঝে না, কীভাবে বলবে। সত্য বললে সবচেয়ে অসত্য লাগবে সেটা। আর ছেলে মারা গেছে- এই কথা একজন মাকে কীভাবে বলবে সে? যেখানে মেয়েকে আগেই হারিয়েছেন তিনি।

“আন্টি, অনিক হঠাৎ শহরের দিকে ফিরে গেছে।" বলে রাহাত।
“শহরের দিকে মানে?" মনোয়ারা বেগম কিছু বুঝতে পারেন না।
“একটা ট্রলার যাচ্ছিলো শহরের দিকে। ওতে চলে গেছে।" রাহাত নিজেও বোঝে কথাটা বিশ্বাস করার মত শোনায় না।
“কিন্তু ওর ব্যাগ? জিনিসপাতি? সবকিছু তো এখানে!” ঘাবড়ে যান মনোয়ারা বেগম।

"ও...," রাহাত আর পারলো না চালিয়ে যেতে, “আন্টি... আসলে...” আটকে যায় রাহাতের কথা।

“কী হয়েছে অনিকের?” উৎকন্ঠা ঝরে পড়ে সে কন্ঠে।

“অনিক স্রোতের মধ্যে নদীতে নেমেছিলো... তারপর আর পাওয়া যাচ্ছে না..."

সাতাশ

স্কুল খুলেছে কয়েকদিন হলো। অনিক এখনো ফিরেনি। আবিরের একটু একাকী লাগে। মাঝে মাঝে কিছু কথা বলার মত মানুষ খুঁজে পায় না। মনে হয় কখন যেন অনিক এই ব্যস্ত শহরে ওর সবচেয়ে কাছের বন্ধু হয়ে গেছিলো।

অনিকের গ্রামের দিকে একটানা বৃষ্টি হয়েছে শুনেছিলো। হয়ত সেজন্য ফিরতে দেরি হচ্ছে- ভাবে আবির। দূরের আকাশের দিকে তাকায়। শহরের দালানগুলোর ভিড়ে আকাশ দেখা যায় না।

(সমাপ্ত)